দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

শিক্ষা প্রসারের প্রধান বাধা বিভিন্ন স্তরে সামঞ্জস্যহীনতা

আবদাল আহমদ ঃ নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সামঞ্জস্যহীনতাই বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই রয়েছে বৈষম্য, রয়েছে বিশৃংখলা। এই অবস্থা যেমন শিক্ষাদান ক্ষেত্রে, তেমনি রয়েছে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ব্যয় নির্ধারণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ শ্রেণীই এযাবৎকাল লাভবান হয়েছে বা হচ্ছে। উপেক্ষিত হচ্ছে দেশের বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি সার্বিক পর্যালোচনা করে অবিলম্বে একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা না গেলে শিক্ষাক্ষেত্রের এই নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে তাতে রয়েছে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক স্তর, তিন বছর মেয়াদী নিম্নমাধ্যমিক স্তর, দু'বছর মেয়াদী মাধ্যমিক স্তর, দু'বছর মেয়াদী উচ্চমাধ্য-

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষা প্রসারের প্রধান বাধা বিভিন্ন স্তরে সামঞ্জস্যহীনতা

মিক স্তর। মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষার পর 'সেকেন্ডারী সার্টিফিকেট' (এসএসসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক ধাপের শেষ পরীক্ষার পর 'হায়ার সেকেন্ডারী সার্টিফিকেট' (এইচএসসি) প্রদান করা হয়। মাদ্রাসার অনুরূপ কাঠামো রয়েছে পাঁচ বছর মেয়াদী 'ইবতেদায়ী' (প্রাথমিক স্তর), পাঁচ বছরের দাখিল এবং দু'বছরের আলিম স্তর। দেশে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার একটি পৃথক ধারা রয়েছে। পলিটেকনিক শিক্ষাক্রম তিন বছরের। এতে এসএসসি পাস শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে।

উচ্চশিক্ষার স্তর শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পর। ডিগ্রী পর্যায়ে রয়েছে দু'বছর মেয়াদী 'পাস কোর্স' এবং তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স। যারা অনার্স কোর্স করেন পরবর্তীতে তারা এক বছরের মাষ্টার্স কোর্স এবং যারা পাস কোর্স করেন তারা পরবর্তীতে দু'বছরের মাষ্টার্স কোর্স করতে পারেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ৫ বছরের এমবিবিএস কোর্স এবং চার বছরের ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স রয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৬১ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় এক কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। এর মধ্যে সাড়ে ৪৫ হাজার প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৬১ হাজার। দশ হাজার ৪৪৮টি মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ২৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৩০ জন। ৩৬৭টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ৪৮১টি ডিগ্রী কলেজে এইচএসসি পর্যায়ের ছাত্রসংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৬১ জন। চার হাজার ৩০৬টি মাদ্রাসায় ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ২৬ হাজার পাঁচশ'। মাদ্রাসায় শিক্ষক সংখ্যা ৫৬ হাজার ৮৯৬ জন। ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮১টি ডিগ্রী কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও চিকিৎসা কলেজ ও ইন্সটিটিউট মিলিয়ে ডিগ্রী ও মাষ্টার্স পর্যায়ের ছাত্রসংখ্যা ৩ লক্ষ ২০ হাজার। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

শিক্ষক—ছাত্র অনুপাত

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত একেক স্তরে একেক রকম। প্রাইমারী স্তরে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হচ্ছে ১ঃ৪৮ অর্থাৎ ৪৮ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক। মাধ্যমিক স্তরে ১ঃ২৬, ইন্টামিডিয়েট স্তরে ১ঃ২৩, ডিগ্রী কলেজগুলোতে ১ঃ২৯, চিকিৎসা ও নার্সিং কলেজগুলোতে ১ঃ১১, প্রকৌশল কলেজগুলোতে ১ঃ১০, কৃষি কলেজগুলোতে ১ঃ৯ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি ১৫ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক। তবে এই অনুপাত হচ্ছে গড় অনুপাত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেদে এই অনুপাতের তারতম্য রয়েছে।

ইন্টারমিডিয়েট সেকশন হাইস্কুল শিক্ষারই একটি অংশ হিসাবে চিহ্নিত হলেও ডিগ্রী পর্যায় থেকে আলাদা করা বা হাইস্কুল পর্যায়ের সঙ্গে একীভূতকরণ সম্ভব হয়নি। এমনকি যেসব হাইস্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী রয়েছে সেখানেও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে 'কলেজ সেকশন' আখ্যা দেয়া হয়। বাংলাদেশে শুধু ইন্টারমিডিয়েট সেকশন নিয়ে কিছুসংখ্যক কলেজ রয়েছে। তবে সব ডিগ্রী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সেকশন রয়েছে। এর কারণ এইচএসসি সেকশন অর্থসংস্থানের সূত্র হিসাবে প্রয়োজন রয়েছে। ফলে সব ডিগ্রী কলেজেই চলছে দ্বৈতশাসন। ইন্টামিডিয়েট চলে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবং ডিগ্রী সেকশন চলে কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে প্রশাসনিক জটিলতা এবং শিক্ষকদের উপর অহেতুক চাপ।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় এবং বিভিন্ন বৈষম্য

দেশের প্রাইমারী শিক্ষা পুরোপুরি সরকারী খাতে; কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলগুলোর মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ ও কলেজগুলোর মধ্যে ৩৫ শতাংশ সরকারী। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদিও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, তবুও এর ৯০ শতাংশ খরচ সরকারী তহবিল থেকে আসে। আর দেশের ক্যাডেট কলেজগুলো পুরোপুরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু বরাদ্দ সবটাই যায় শিক্ষাখাত থেকে। সরকারের আবর্তক ব্যয়ের নিরিখে মাথাপিছু বার্ষিক ছাত্রব্যয় সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ৪৪০ টাকা, মাধ্যমিক স্কুলে ১৬৩৫ টাকা, মাদ্রাসায় ৪১৩৫ টাকা, ক্যাডেট কলেজে ২৩ হাজার ৫১০ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ হাজার টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলো যে পরিমাণ বরাদ্দ পেয়ে থাকে তা থেকে সত্যিকারভাবে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষাখাতের মোট বাজেটের সিংহভাগ বেতন ভাতা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে খরচ হয়। শিক্ষাখাতে খরচ হয় ১০ শতাংশেরও কম। আরও যেটা সত্য তা হচ্ছে যখনই অর্থের অনটন ঘটে সেই ঘাটতি আসে সাধারণ শিক্ষা, গবেষণা বা শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে। ফলে যা হবার তা-ই হচ্ছে। জোড়াতালি দিয়ে ক্লাসসমূহ চলে। ছাত্ররা কোনরকম একটা সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে যায়। ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মোট বাজেট ছিল সাড়ে ৯১ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেতন-ভাতা বাবদ খরচ হয়েছে ৫৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ২৯ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। শিক্ষা ও গবেষণা খাতে খরচ হয়েছে মাত্র ৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।

পাস কোর্স অনার্স কোর্স জটিলতা

ডিগ্রী পর্যায়ে রয়েছে পাস কোর্স ও অনার্স কোর্স। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যুক্ত বাংলার সব স্কুল-কলেজ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য সব ডিগ্রী কলেজে পাস কোর্স ও অনার্স কোর্স উভয়ই ছিল দু'বছর মেয়াদী। অনার্স কোর্সে শুধু পাঠ্য বিষয় বেশী ছিল। পাকিস্তান আমল থেকে বর্তমান বাংলাদেশে পাস কোর্স দু'বছর মেয়াদী রয়ে গেছে। কিন্তু অনার্স কোর্স ৩ বছর মেয়াদী। এই ৩ বছর পর এমএ/এমএসসি কোর্সে এক বছর। অনার্স কোর্স করার পর বেশীর ভাগ মাষ্টার্স কোর্সে ভর্তি হতে পারছে। কিন্তু পাস কোর্সের পর তা দুষ্কর। তাছাড়া অনার্স ডিগ্রীর মর্যাদা বেশী দেয়া হয়। এমনকি চাকরির ক্ষেত্রেও অনার্সের অগ্রাধিকার। ফলে অনার্স কোর্সে ভর্তির জন্য সবাই থাকে উদগ্রীব। এর ফলে বিশ্বদ্যালয়গুলোতে চাপ বেড়ে যায়। বর্তমানে ৪৩টি সরকারী কলেজে অনার্স খোলা হয়েছে। কিন্তু অনার্স কোর্স খোলাটাই সমস্যার শেষ নয়। সীমিত সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে কোনক্রমে কোর্স চালু রাখা হয়েছে।

পাস ও অনার্স কোর্স নামক দু'টি সমান্তরাল ধারা বর্তমানে কোথাও চালু নেই। থাকলেও গুটিয়ে ফেলার প্রস্তুতি চলছে। সর্বত্রই আজকাল ন্যূনতম তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স চালু রয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর 'পাস' বা 'অনার্স' শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে।

ভর্তিসমস্যা

সঙ্গত কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা অনার্স কোর্সে ভর্তি হতে আগ্রহী। কিন্তু ভর্তিক্ষেত্রে রয়েছে অসহনীয় পরিস্থিতি। দেশের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৩টি সরকারী কলেজ, ডেন্টাল ও নার্সিংসহ ১১টি চিকিৎসা কলেজ, ৪টি প্রকৌশল কলেজ, ২টি কৃষি কলেজে মোট আসন রয়েছে মাত্র ১৮ হাজার ৯৪০টি। কিন্তু প্রতিবছর ভর্তিচ্ছু যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যাই দাঁড়াচ্ছে ৭০ হাজার- অর্থাৎ যারা প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করেছে। ফলে ভর্তির যোগ্য শতকরা ৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অনার্স বা সমপর্যায়ের কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না।

অধিভুক্ত কলেজের সমস্যা

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৬০ হাজার এবং ৪৮১টি ডিগ্রী কলেজে প্রায় ৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। কলেজগুলো সরকারী হোক বা বেসরকারী হোক এগুলো তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সিলেবাস কারিকুলাম অনুযায়ী ছাত্রদের শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষা শেষে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেই ডিগ্রী লাভ করে। প্রশাসনিক দিক দিয়ে সরকারী কলেজগুলো পুরোপুরি উচ্চশিক্ষা পরিদফতরের আওতাধীন। বেসরকারী কলেজগুলো নামেমাত্র স্বশাসিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ২/৩ গুণ বেড়ে গেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর দিকে নজর দিতে পারছে না। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কোর্স পদ্ধতি, সেমিস্টার পদ্ধতিতে পড়ানো হয়। কিন্তু কলেজে চলছে সনাতন পদ্ধতি। এ অবস্থায়ও নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক কথায়, উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে একাডেমিক সমস্যা পুরো সিস্টেমকে পঙ্গু করে ফেলছে।